গৌর যাযাবর

১

বুঝলি বুধা, তোকে ছেড়ে যেতেই যা একটু কষ্ট, নইলে কবেই যেদিকে দুচোখ যায় চলে যেতাম। তা, যেতে আমাকে হবেই। তাছাড়া আর উপায় কী বল। চোখের জল না ফেলে একবেলা আমাকে ভাত খেতে দেখেছিস? আর সে কী ভাত! শিলাবৃষ্টির সময় মাঠ কুড়িয়ে ঠিক যেন একমুঠো শিল মুখে তুলছি। খিদেয়, একেকদিন — তোকে আর বলতে লজ্জা কী — একেক দিন ভগবানকে বলেছি, আর জন্মে যেন তোর মতো গোরু হয়ে জন্মাই; অন্তত খোল-ভুষিটা তো জুটবে। বুধা রে, যার মা চলে গেল, বাপ চলে গেল — যাক, কাল দোল, দোলের দিন কোথায় আর অজানা পথে মুখে কালি, পিঠে গাধার ছাপ মেখে ঘুরে মরব, কালকের দিনটা যাক, পরশু থেকে আমি আর এ গাঁয়ের ত্রিসীমানায় নেই। বুধা রে, দেখ, এই দেখ, এখনই আমার চোখে জল এসে গেছে। তুই, আর এই বটগাছ — তোরা দুটিই ছিলি এ গাঁয়ে আমার পিছুটান।

বুধা বুঝুক না-বুঝুক, গৌরের যা কিছু কথা সব ওই গোরুর সঙ্গে। সাহাবাবুদের বড় ছেলের বাতিল গেঞ্জি ঝড়-খাওয়া কলাপাতার মতো গৌরের হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। তারই এক ফালি তুলে ভালো করে চোখের জল মুছে গৌর ধরা গলায় বলল, পরশু থেকে তোরা কোথায় আর আমি কোথায়! কী করব বল, আমি যে নিরুপায়। কাল দোলের দিন আমি তেরোয় পড়ব। তাহলেই বোঝ, আদ্দেক জীবনই কেটে গেল সাহাবাবুদের গোলামি করে আর গালাগাল খেয়ে। আর যে কটা দিন আছি, একটু মনের মতো বাঁচতে ইচ্ছে হয় না? সন্ধের মুখে, নতুন জোছনায়, তকতকে দাওয়ায় বসে ধোঁয়া-ওঠা ভাত খেয়ে নিজের কাঁথাটিতে শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে না পারলে, বুধা তুই-ই বল, মানুষ বাঁচে!

বুধা ঘাস খেতে খেতে একবার গৌরের কাছে আসে, আবার ঘাস খেতে খেতেই দূরে সরে যায়। এবার যেই কাছে এসেছে, গৌর হাত বাড়িয়ে বুধার গলা ছুঁতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝিঁঝির ডাক শুরু হতেই লাফিয়ে ওঠে। সর্বনাশ! বটগাছের ছায়া লম্বা হয়ে একেবারে খালপাড় ছুঁয়েছে! পশ্চিমে ঘুরে দ্যাখে, তাল-সুপুরির সারির ফাঁক দিয়ে সুয্যিঠাকুর গনগনে চোখে চেয়ে আছে! গৌর তার মায়ের কাছে শুনেছিল, অস্তগামী সূর্য আসলে শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়ন। কীর'ম ধ্বক-ধ্বক করে দেখিসনি?

ভয় শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়নকে নয়, মা-বাবা বেঁচে থাকতে সঙের মেলায় সে অনেকবার শিবঠাকুর দেখেছে, শিবঠাকুরকে তার ভালোই লাগে। গৌরের আসল ভয় সাহাবাবুর রক্তচক্ষুকে। সন্ধে হতে চলল, এখনো গোরু গোয়ালে ওঠেনি, আজ নির্ঘাৎ গৌরের পিঠের চামড়া দিয়ে ডুগডুগি হবে।

গৌর লাফ-ঝাঁপ দিয়ে সব কটা গোরুকে এক জায়গায় করতে করতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাঁদ খালপাড়ের গাছপালা ছেড়ে আকাশে উঠে এসেছে। মনে হয় কাল নয়, আজই পূর্ণিমা। ভয়ে না সাহসে কে জানে, গৌর হঠাৎ পিছন ফিরে অস্ত-সূর্যকে জোড়হাতে নমস্কার করল। তারপর সামনের আকাশে চাঁদকে নমস্কার করল। তারপর বুধার গলা জড়িয়ে তার কপালে নিজের গালটি চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

যখন মুখ তুলল, সূর্য ডুবে গেছে, চাঁদ আরো জ্বলছে, বুধার কপালে গৌরের চোখের জল জোছনায় চিকচিক করছে।

গৌর এবার আর চোখ মুছল না। শুধু গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, বিদায়, বুধা। বিদায়, বট! বলেই উলটো মুখে হন হন করে হাঁটতে লাগল। তার বুধা, তার বটগাছ, তার গ্রাম তার বুকের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তাকে পিছনে ডাকছে কিন্তু সে আর ফিরে তাকাল না।

প্রথমে মাঠ, তারপর রেললাইন, তারপর সঙ্গী বলতে শুধু জঙ্গল আর চাঁদ। গৌর চলেছে তো চলেইছে, কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না। গ্রাম ছেড়ে আসার দুঃখ আর সাহাবাবুদের গৃহত্যাগের আনন্দ তাকে আজ ভারি আনমনা করে ফেলেছে। গৌরের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, সে বেশ একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছে।

হঠাৎ অনেক দূরে গাছপালার ফাঁক দিয়ে আগুন চোখে পড়তেই গৌরের ঘোর ভাঙে, সে সতর্ক হয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারল, দোলের আগের দিন ছেলেরা 'বুড়ির ঘর' পোড়াচ্ছে। তারও হাত সুড়সুড় করে উঠল, কিন্তু এখন কি তার উৎসবে মাতলে চলে? রাত বাড়বার আগে একমুঠো ভাত আর একটু শোবার ব্যবস্থা না করতে পারলে মুশকিল। সারা রাত ধরে অচেনা জঙ্গলে হেঁটে বেড়ানো কোনো কাজের কথা না। পেটের মধ্যে তো এঁড়ে বাছুর দৌড়চ্ছে!

গৌর আগুনের ধার দিয়েই গেল না। ডাইনে ঘুরে জঙ্গল পেরিয়ে সামনেই দেখে একটা পুকুর। গ্রাম ছাড়বার সময় যে চাঁদটাকে সে নমস্কার করেছিল সেই চাঁদ দিব্যি এই পুকুরে নেমে পড়েছে। একদম জলের তলায়। পুকুর পাড়ের নারকোল গাছের সারিও উলটে গিয়ে জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৌরের খুব ইচ্ছে হল, ঝাঁপিয়ে পড়ে বার কতক এপার-ওপার করে নেয়, কিন্তু সে ইচ্ছেও সে আপাতত তুলে রাখল। ওই দিকে ছেলেরা বুড়ির ঘর পোড়াচ্ছে, এইখানে পুকুর, তার মানে, যাক বাবা, একটা গাঁ তো পাওয়া গেছে! আর গাঁ যখন, কেউ না কেউ আশ্রয় দেবেই। পুকুর তো আর রাতারাতি পালাচ্ছে না!

গৌরের এইসব চিন্তা বা অনুমান কখনো ভুল হয় না। পুকুর ছাড়িয়ে এ-গাছতলা সে-গাছতলা দিয়ে কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল দূরে দূরে দশ বিশটা কুঁড়েঘর যে যার সামনের উঠোনে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে ঠিক যেন কোল পেতে বসে আছে।

গৌর সবচেয়ে কাছের বাড়িটার উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই ধপধপে উঠোনে তারও ছায়া পড়ল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল, এ বাড়ির উঠোনের সঙ্গে তার ছায়াটার যেন

অনেক দিনের জানাশোনা! ভারি মিশ খেয়ে গেছে।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই যা ঘটল, গৌরের কান একেবারে খাড়া।

ঘরের মধ্যে হেঁড়ে গলায় কে একজন বলে উঠল, বাবা! পচাকে আমি পাকের ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে এলাম, আপনি লাঠি নিয়ে চলুন।

— ফের চুরি করেছে?

নিশ্চয় বাবার গলা। একদম মেঘের ডাকের মতো।

হেঁড়ে গলার লোকটা বলল, হ্যাঁ বাবা। সাঁঝ লাগতেই কার বাড়ি থেকে গামছা, সাবান আর একটা ফুল প্যান্ট ঝেড়ে এনেছে!

— ওর ভাগ্যে এবছর আর দোল খেলা নেই। আজই ওর শেষ দিন! তুই যা, আমি একটু তামাক খেয়ে আসছি।

গৌরের পা মাটিতে সেঁটে গেছে। সে দু-কান খাড়া করে তামাকের গুড়ুক-গুড়ুক শুনছে আর ভাবছে, এরপর কী? লোকটাকে সত্যিই কি মেরে ফেলবে না কি? এরকম ঘটনার পর এ বাড়িতে আশ্রয় চাওয়াও তো সহজ নয়।

— চোরপুত্রের জনক হওয়ার চেয়ে আমি আজ পুত্রহারা হব! প্রথমে ডান হাত পাত —

এ সেই মেঘের ডাক।

এবারের গলা নিশ্চয়ই পচার। লোকটা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে বলল, এবারটা খালি ক্ষমা করুন বাবা। ও দাদা, হাতের বাঁধন খুলে দে, বাবার পায়ে ধরব। এবারটা আমায় ছেড়ে দিন। আর কখনো চুরি করব না। বাবা, বাবা গো, এ আমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞে।

— প্রতিজ্ঞা তো গত হপ্তায়ও করিছিলি। কচি, গত হপ্তায়ও ও ভীষ্মের নাম নেয়নি?

হেঁড়ে গলার লোকটা বলল (এ-ই তাহলে এনার বড়ছেলে, পচার দাদা) — না বাবা, সেবার যুধিষ্ঠিরের নাম নিয়ে প্রতিজ্ঞে করেছিল।

— চোরের মুখে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের নাম! বল তোর জীবনের শেষ ইচ্ছে কী? একটু আবির খেলতে চাস তো দোলের আগেই খেলে নে। তোর আয়ু আর আধ ঘণ্টা। পচা কঁকিয়ে উঠল, এবারটা খালি ছেড়ে দিন বাবা। আর আমি চুরি করব না। ওরে দাদা, বাবার চরণ-দুটি একবার ছুঁতে দে।

— কচি, সাবধান! বাঁধন না খোলে! তোর মা ঘাট থেকে না ফেরা অব্দি অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

বাবার শেষ রায় শুনে পচা এবার আকাশ ফাটিয়ে ডেকে উঠল — ও মা! মা গো! মা আমার! পচার এই গলা ছেড়ে মা ডাক শুনে গৌরের বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল।

গৌর শুনল, বাবা বলছে — কচি, ঘর থেকে আমার হুঁকোটা এনে দে। তামাক পালটে দিস।

এরপর শুধু পচার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর ওদের বাবার গুড়ুক-গুড়ুক তামাক খাওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই।

গৌর ভাবছে, নিজের গ্রাম ছেড়ে এসে এ কোন বিপাকে পড়া গেল! হঠাৎ পিছনে ভিজে কাপড়ের ছপ ছপ শুনে মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কাদের যেন মা — বোধহয় পচা

কচিদের মা-ই হবে, উঠোনের এক ধার দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

ওদিকে বাড়ির মধ্যে ঠিক তখনই তামাক খাওয়ার শব্দ থেমে গেছে আর পচা, বোধহয় মাকে দেখেই, নতুন করে কেঁদে উঠল — মা, মা গো! আর তোমায় মা বলে ডাকতে পাব না গো!

মায়ের গলা চিলের ডাকের মতো। গৌর শুনল, তিনি গলা চিরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন — ফের, ফের কচি, ঘরের খুঁটির সঙ্গে পচাকে বেঁধেছিস! ঘর যদি ভেঙে পড়ে তো আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

— এঃ, চোরের মার বড় গলা! ন্যায় বিচারে নাক গলাতে এসো না বলছি বউ! পচাকে আজ আমি নিজের হাতে শেষ করে শ্মশানে নিয়ে যাব। তুমি ভিজে কাপড় ছেড়ে এসে ওকে শেষ দেখা দেখে নাও।

গৌর কতক্ষণ আর সহ্য করবে, এবার সোজা বাড়ির ভেতরে ঢুকে ওপাশের উঠোনে লাফিয়ে পড়ে পচার বাবাকে বলল, এইবারটা এনাকে ছেড়ে দিন, আমি এনাকে বাল্মীকি-আখ্যান গেয়ে শোনাব, দেখবেন তিনি আর কখনো চুরি করবেন না।

পচার বাবার ধপধপে শাদা চুল-দাড়ি। বড় ছেলে কচির চুলও অর্ধেক শাদা। পচা ঘরের খুঁটির সঙ্গে গোরুর দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার মাথার চুলে সবে পাক ধরেছে।

পচার বাবা হুঁকো রেখে লাঠি তুলেছিলেন, গৌরকে পুরো এক মিনিট ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, পচার চুরির কথা তুই জানলি কী করে? মৃত্যুদণ্ডের কথাই বা তোকে কে বলল?

গৌর এই সুযোগে ধাঁ করে বুড়োকে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়ে বলল, আজ্ঞে, আমি এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম।

— কেন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলি?

— আজ্ঞে, আপনাদের এখানে এসেছিলাম একটু আশ্রয়ের খোঁজে।

— নাম?

— আজ্ঞে, গৌর।

— কী বললে বাবা? গৌর? দোলপুন্নিমের আগের রাতে তুমি বাবা গৌর এলে গরিবের কুঁড়েয়। ওরে কচি, ওরে পচা, এক্ষুনি জাল নিয়ে পুকুরে ছোট। বড় দেখে একটা কাতলা ধরে আন শিগগির। আহা রে, মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

বলতে বলতে কচি-পচার মা গৌরের হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আসন পেতে তাকে বসিয়ে দিল।

পচা কান্না ভুলে বলে উঠল, দাদা আমার বাঁধন খুলে দে — বাবা, আপনি দাদাকে বলুন।

কচি-পচার বাবা এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পচার বাঁধন খুলতে খুলতে বললেন, যা ব্যাটা, বেঁচে গেলি। ঘরে অতিথি এসেছে, তোর দণ্ড মকুব হয়ে গেল। এই যে বাবা, কই, তোমার বাল্মীকি আখ্যান ধরো দেখি।

— মা যে কচিবাবু-পচাবাবুকে মাছ ধরতে পাঠাচ্ছেন! কাজ-কম্মো মিটিয়ে, একেবারে দুটি শাকান্ন খেয়ে গান ধরলে হয় না?

গৌর অনেক দিন পরে প্রাণের সুখে পেট ভরে ভাত খেল। তারপর চতুর্দশীর খোলা উঠোনে চোখ বুজে বসে দস্যু রত্নাকরের মহাকবি হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত গেয়ে শোনাল। কথা ও সুর তার আগাগোড়া মুখস্থ। গলাটিও ভারি মিষ্টি।

গান শেষ করে চোখ খুলে দেখে সকলের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, কেবল পচাবাবু বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, গান থামতেই ধড়মড় করে জেগে উঠে চোখ রগড়াচ্ছে। কী ভাগ্যি, গৌর ছাড়া আর কেউ দেখে ফেলেনি। ওরা ভেবেছে, পচাও বুঝি তাদের মতোই কাঁদছে।

গ্রাম ছেড়ে আসার সময়, পথে, গৌর একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেলেছে, কারো বাড়িতেই সে একদিনের বেশি আশ্রয় নেবে না। পৃথিবীতে বাড়ি তো আর কিছু কম নয়। আকাশের তারাদের চেয়ে বেশিই হবে হয়তো। তাছাড়া সে-ও তো আর লক্ষ লক্ষ দিন বেঁচে থাকবে না।

পরদিন সকালে আশ মিটিয়ে পুকুর সাঁতরে, পেট ভরে পান্তা-টান্তা খেয়ে গৌর ছেলেদের দোলের রং এড়িয়ে সবে নতুন একটা জঙ্গলের পথ ধরেছে, হঠাৎ সামনের গাছ থেকে ঝুপ করে কে লাফিয়ে পড়ল। কে রে বাবা! আর কেউ না, পচা। মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে গৌরের কাছে এসে বলল, ভারি বুদ্ধি তোর। আমার দলে আসবি? আমি একটা ডাকাতের দল গড়ব ভাবছি।

গৌর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, হঠাৎ আপনার এ দুর্মতি কেন?

— ছিঁচকে চুরি করে এ-বয়সে বাবার মার আর সহ্য হয় না।

গৌরের ইচ্ছে হল, বলে, কাল আপনার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু যতই রাগ হোক, একথা কি আর সত্যিই কাউকে বলা যায়! সে একটু দাঁত চেপে বলল, এসব বদ খেয়াল ছেড়ে মানুষের মতো বাঁচতে চেষ্টা করুন।

পচা ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিয়ে বলল, ডাকাতি করে বস্তা বস্তা টাকা হলে তখন কত সুখ একবার ভেবে দেখেছিস?

গৌর তার নাকের সামনে থেকে পচার বিড়ির ধোঁয়া তাড়াতে তাড়াতে বলল, ধ্যুর! সন্ধেবেলা চাট্টি গরম ভাত খেয়ে নিজের কাঁথায় শুয়ে বাপ-মায়ের মুখ ভাবতে পারার মতো সুখ আর পৃথিবীতে আছে নাকি! এত বয়েস হল আপনার, আপনি লোকটা কিন্তু বড্ড বোকা!

বলে গৌর আর দাঁড়াল না, তার চারপাশের পৃথিবী দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল। সন্ধে হবার আগে রাতের মতো একটু আশ্রয় আর একমুঠো ভাত ঠিকই হয়ে যাবে।

(আংশিক)

প্রকাশ: *জানুয়ারি ১৯৯১*